মাতৃপ্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীমা : মননের আলোয়

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

একটি প্রশ্ন আমাদের মনে সবসময় ঘুরে বেড়ায় : এই জগৎ কে সৃষ্টি করেছে? জীবন ও জগতের ঘটনাবলিকে কে নিয়ন্ত্রণ করছে? যুগযুগান্ত ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অধ্যাত্মসাধক সৃষ্টির বাহ্য ও অন্তর্জগতের সব কিছুর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুভব করেছেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক অমিত শক্তিকে। জগতে যে-শক্তি আমরা অনুভব করি তার রূপভেদ আছে। শক্তির রূপভেদ যাই হোক না কেন, জগৎ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ শক্তির অস্তিত্ব সবাই স্বীকার করেন। এই শক্তিকে আমরা নামরূপের আঙ্গিকে মায়া, প্রকৃতি, সগুণব্রহ্ম বা জগজ্জননী বলে থাকি। বেদ বলেন, চরম সত্য সৃষ্টির অতীত। বেদ তাকে বলেন ব্রহ্ম। তন্ত্রের দৃষ্টিতেও চরম সত্য সৃষ্টির অতীত এবং তা শক্তিস্বরূপ। বেদান্তে যা ব্রহ্ম তন্ত্রে তা নিরাকারা শক্তি। সাধক সন্তানের কল্যাণে অরূপ ধারণ করেন সাকার মাতৃরূপ। মাতৃ-আরাধনায় মন পবিত্র ও সূক্ষ্ম হলে মা সাধককে অরূপের ঘরে নিয়ে যান। তখন মাতা-সন্তানের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তা পরম সত্তায় লীন হয়।

জগতের চালিকা শক্তি আদতে সর্বব্যাপিনী চৈতন্যশক্তি। সুখ-দঃখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বিষাদ, জীবন-মৃত্যু, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভালবাসা-ঘৃণা—এই বৈপরীত্যের অভিব্যক্তির সাহায্যে তাঁর সৃষ্টি সমাধা হয়েছে। এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। কেন এ-নিয়ম তা প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের নেই, কারণ আমরা সকলে সেই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তবে মানুষ চেষ্টা করলে সাধনার সাহায্যে সেই নিয়মকে অতিক্রম করতে পারে। সেই অতিক্রান্ত অবস্থাকে বলে মুক্তি। যদি কেউ সৃষ্টির সঙ্গে আগ্রহের ভিত্তিতে থাকতে চান, তা তিনি করতে পারেন। তবে সেই অবস্থার নাম বন্ধন। মহাশক্তি একদিকে যেমন মুক্তিবিধাত্রী, তেমনি অন্যদিকে বন্ধনকারিণী। হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও জড়ের উপাসনা নেই। এজন্য যাঁরা হিন্দুদের পৌত্তলিক বলেন, তাঁরা বাস্তবে কৃপার পাত্র। শাস্ত্র সাধারণ মানুষের জন্য জল, ঘট, পট, প্রতিমা, বীজ, ওঙ্কার প্রভৃতি উপাধি দ্বারা শুদ্ধচৈতন্যের উপাসনার বিধান দিয়েছেন। ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার নিকটতম সম্বন্ধ। তাই মহামায়ার উপাসনা করলে ব্রহ্ম শীঘ্র প্রসন্ন হন। তন্ত্রমতে দেবী-উপাসনায় মানুষ ইহলোকে সব বাঞ্ছিত ভোগের অধিকারী হয়, মৃত্যুর পর দেবীলোকে গমন করে এবং তাঁর কৃপায় মুক্তিলাভ করে।

'শিব' শব্দ থেকে 'ই'কারকে সরিয়ে দিলে তা

শব হয়ে যায়। 'ই'কার-ই ইচ্ছারূপিণী মহাশক্তি। রামপ্রসাদের গানে আছে : ''শিব নয় মায়ের পদতলে/ওটা মিথ্যে লোকে বলে,/ দৈত্য ব্যাটা ভূমে পড়ে/ মা দাঁড়ায়ে তার উপরে/ মায়ের পাদস্পর্শে মানবদেহ/ শিবরূপ হয় রণস্থলে।'' শক্তির প্রাধান্যে চরণলগ্ন অসুরের শবই শিবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মায়ের চরণলগ্ন হলে জীবনযুদ্ধের কালে মায়ের কৃপায় আমাদের আসুরিক বৃত্তি শিবত্বে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আচার্য শংকর তাঁর দেবীস্তুতিতে বলেছেন, ভবানীর পাণিগ্রহণের ফলেই নিঃস্ব শ্মশানচারী শিব জগদীশ্বর পদবী লাভ করেছিলেন।

আদ্যাশক্তি জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াময়ী। দেবীর ত্রিকূট মন্ত্রে তা বিধৃত হয়ে আছে। ত্রিকূট মন্ত্র যথাক্রমে বাগ্‌ভবকূট, কামরাজকূট এবং ক্রিয়া বা শক্তিকূট। বাগ্‌ভবকূট মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, কামরাজকূটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী, যিনি ইচ্ছারূপিণী। মহানির্বাণতন্ত্র বলছেন, শিব সকল প্রাণীকে কলন করেন অর্থাৎ গ্রাস করেন, তাই তিনি মহাকাল। অপরপক্ষে, দেবী মহাকালকে কলন করেন বলে তিনি আদ্যাশক্তি বা মহাকালী। এছাড়া ক্রিয়া বা শক্তিকূট মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা বা বগলা। ত্রিকূট মন্ত্রের মূল দেবী ষোড়শী। অর্থাৎ ত্রিকূট মন্ত্রের মাধ্যমে ষোড়শীর আরাধনা করা হয়। এইসব দেবীসমূহ অর্থাৎ সরস্বতী, কালী, দুর্গা বা বগলা—ষোড়শীরই বিভূতি বা অংশ। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে ষোড়শীজ্ঞানে পূজা করে তাঁর সমস্ত সাধনার ফল ও জপের মালা শ্রীমায়ের চরণে অর্পণ করেছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অনুমিত হয়, শ্রীমা সারদা কী মহাশক্তির অধিকারিণী ছিলেন! স্বামী প্রেমানন্দজী একটি চিঠিতে লিখেছেন, ''শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে?... ঐশ্বর্যের লেশ নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল; তাঁর ভাবাবেশ সমাধি এসব আমরা জন্মে দেখেছি... কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কি মহাশক্তি!... জয় শক্তিময়ী মা!'' কাশীধামে লক্ষ্মীনিবাসে থাকার সময় গোলাপ মায়ের মাধ্যমে শ্রীমা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শক্তিপূজা আগে করতে হয় কেন। উত্তরে ব্রহ্মানন্দজী বলেছিলেন, ''মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।''

শ্রীমা সারদা সদাপ্রসন্না, চিরবরদা। শ্রীমা ঘোরা নন, তিনি অভয়া। তিনি অভয় দিয়ে বলছেন, ''আমি রয়েছি। আমি মা থাকতে ভয় কী?'' তাঁর কাছে কখনও কেউ প্রত্যাখ্যাত হননি। মায়ের যুগপৎ মমতা ও বৈরাগ্যের অনুপম শক্তি প্রত্যক্ষ করে স্বামী সারদানন্দজী বলেছেন, ''মার মহিমা, মার শক্তি কত আমাদের কী সাধ্য বুঝি! এমন আসক্তি দেখিনি। এমন বিরাগও দেখিনি।'' অন্যত্র মা যেন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে বলছেন, ''কী করব, [আমি যে] নিজেই মায়া!'' একদিন জয়রামবাটীতে শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে পূজার ঘরে স্থির হয়ে বসে আছেন। তাঁর মন তখনও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ফিরে আসেনি। শ্রীমায়েরই এক মন্ত্রশিষ্য শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''মা, আপনি ঠাকুরকে কীভাবে দেখেন?'' মা কিছুক্ষণ নীরব থেকে গম্ভীরভাবে বললেন, ''সন্তানের মতো দেখি।'' উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা স্তব্ধ হলেন। মা-ও এক গভীর মৌনতায় ডুবে গেলেন। দেবীসূক্তে আছে 'অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্'—বিশ্বপিতারও আমি প্রসবিতা। শ্রীমায়ের কণ্ঠে শোনা গেল সেই বাণীর প্রতিধ্বনি।

স্বামী সুবোধানন্দ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সোনারগাঁ আশ্রমে একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন : শ্রীরামকৃষ্ণ একবার জয়রামবাটী গিয়েছেন। রাত্রে আহারের পর, শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ঘরে ছিলেন সেই ঘরে ঢুকে শ্রীশ্রীমা দেখলেন

খাটে কেউ নেই। কেবল একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ সেখানে জমাট হয়ে রয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও অস্তিত্ব নেই। তা দেখে মা আর বিছানা স্পর্শ না করে ঘরের কোণে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন সারা রাত। রাত্রি অবসানে শ্রীশ্রীঠাকুর সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীমাকে প্রত্যক্ষ করে বললেন, ''তুমি এইরূপে আবির্ভূত হয়েছ! বেশ বেশ!'' বলে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন।

শ্রীমা ছিলেন অতুলনীয়া। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। সেই অতুলনীয়াকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরই এক অতুলনীয় সন্তান। একদিন স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমাকে প্রণাম করে বলছেন, ''মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ওই একটিই, আর দ্বিতীয় নেই!'' শ্রীমা তাঁর অহৈতুকী ভালবাসার প্রসাদগুণে উচ্চ-নীচ, গৃহী-সন্ন্যাসী, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-পণ্ডিত, নারী-পুরুষের হৃদয় জয় করে তাঁদের অন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসম্পদে পূর্ণ করে দিতেন। আজও সেই শক্তিসঞ্চার একইভাবে বিদ্যমান। তাই শ্রীমায়ের প্রতি সকলের আকর্ষণ অধিকতর, কারণ শ্রীমায়ের স্নেহে কোনও বাছবিচার নেই, কোনও শর্ত নেই। একথা ঠিক যে মায়ের জীবনে আমরা অপরিমেয় স্নেহ বা ভালবাসার স্পর্শ পাই। কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সে-ভালবাসায় কোনও দুর্বলতা নেই, কারণ প্রেম বা স্নেহের সঞ্চারের আঙ্গিকে শ্রীমা আমাদের যা দান করেন তা হল জ্ঞান। তাই শ্রীমায়ের জীবনে জ্ঞান ও প্রেমের আশ্চর্য সম্মিলন আমাদের মুগ্ধ করে। মায়ের মন্ত্রশিষ্য সুরেন্দ্রনাথ সরকার একদিন কলকাতায় মায়ের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন, মাকে বলছেন, ''মা, আমার তো শান্তি হয় না। মন সর্বদা চঞ্চল—কাম যায় না।'' এই কথা শুনে মা অনেকক্ষণ সুরেন্দ্রনাথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। কিছুই বললেন না। মায়ের মুখ দেখে বক্তার আত্মগ্লানি এল—কেন মাকে এসব বলতে গেলাম? তিনি মায়ের পদধূলি নিয়ে সেখান থেকে কথামৃতকার শ্রীম—'মাস্টারমশাই'য়ের বাড়ি গেলেন। তাঁকে প্রণাম করে বললেন, ''আপনি ঠাকুরের অনেক পদসেবা করেছেন, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন—মাথাটা গরম।'' শ্রীম বললেন, ''সে কি? আপনি মায়ের ছেলে, মা আপনাকে খুব স্নেহ করেন। আপনি আমার নিকট কিসের কাঙাল? মা কি আপনাকে চেয়ে দেখেন নাই?'' সুরেন্দ্রনাথ বললেন, ''হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখেছেন।'' উত্তরে শ্রীম আবেগমথিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ''তবে আর কি? 'সদানন্দসুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়'।'' একথাটি তিনি আবেগভরে তিনবার বললেন। মায়ের অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকার অর্থ সুরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন। তাঁর মনে হল, শ্রীশ্রীমা যেন নিজের কৃপাদৃষ্টির অর্থ বুঝিয়ে দিতেই মাস্টারমশাইয়ের কাছে তাঁকে পাঠিয়েছেন।

অন্য একদিন ভক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ উদ্বোধনে মাকে দর্শন করতে গিয়েছেন। মাকে প্রণাম করার পর মা করজোড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির কাছে প্রার্থনা করলেন, ''ঠাকুর, এদের সকল বাসনা পূর্ণ কর।'' সুরেন্দ্রনাথ চমকে উঠে বললেন, ''সে কি, মা, সকল বাসনা পূর্ণ করলে তো উপায় নেই! মনে যে কত কু-বাসনা রয়েছে!'' মা হেসে বললেন, ''তোমাদের সে ভয় নেই। তোমাদের যা দরকার, যাতে ভাল হয়, ঠাকুর তাই দেবেন। তোমরা যা করছ করে যাও। ভয় কী? আমরা তো রয়েছি।''

একবার বাবুরাম মহারাজকে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''বেলুড় মঠে কল্পতরু উৎসব পালিত হয় না কেন?'' মহারাজ বলেছিলেন, ''ঠাকুর যে এখানে নিত্য কল্পতরু!'' তাই শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য

আশীর্বাদের সঙ্গে স্মরণ করতে হয় শ্রীমায়ের দিব্য আশ্বাস তথা কৃপার বিচ্ছুরণ : ''আমরা তো রয়েছি।'' বেলুড় মঠ অতিক্রম করে কলকাতা নগরী, কলকাতা অতিক্রম করে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে সেই অস্তি-র আশ্বাস—''আমরা তো রয়েছি।'' কালে কালান্তরে প্রচারিত হয়ে চলেছে সেই অনন্য বাণী—''আমরা তো রয়েছি।'' জগৎকল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণ সশক্তিক রয়েছেন, থাকবেন চিরকাল। শ্রীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বন করে আমরা যদি আমাদের জীবনে মাতৃভাবের উদ্বোধনে যত্নবান হতে পারি তাহলে আগ্রাসী লোভের জগৎ থেকে, কুৎসিত প্রতিযোগিতার বদ্ধ দশা থেকে আমরা মুক্তির দিশা লাভ করব। মাতৃভাব আসলে মানসিক উৎকর্ষের সফলতম এবং সুন্দরতম প্রকাশ। যাঁর হৃদয় ক্ষমা, দয়া, সেবা, পরার্থপরতা প্রভৃতি দৈবী ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, বুঝতে হবে তাঁর ভিতরে মাতৃভাবের প্রকাশ ঘটেছে। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলে এই ভাবের অনুগামী হতে পারেন। সকলের জীবনেই এই ভাবের বিকাশ সম্ভবপর। কাজটি কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। ক্রমাগত এই ভাবের অভ্যাস আমাদের স্বার্থপরতাকে কমিয়ে দেয়। যত আমরা নিঃস্বার্থ হতে প্রয়াসী হব, আমাদের অন্তরে তত মাতৃভাব জাগরূক হবে। কারণ স্বামীজী বলেছেন, মাতৃশক্তিই জগতে পক্ষপাতশূন্য মহাশক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবস্থায় উচ্চারিত বাণী 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' নরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তী কালে সেই ভাবকে বাস্তবায়িত করেছেন যা বর্তমান পৃথিবীর রক্ষাকবচ হিসেবে স্বীকৃত। জীব যদি শিবজ্ঞান লাভ করতে চায়, তাহলে তার সেবার পথ অনুসরণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পন্থা নেই। ইচ্ছারূপিণী ক্রিয়াশক্তি বা সেবাকর্ম জীবকে শিবত্বে পৌঁছে দেয়। সেবাই হচ্ছে মা অথবা অভিব্যক্ত মাতৃভাব। মা অথবা মাতৃশক্তি সেবার রূপ ধরে জীবকে অখণ্ডের ঘরে পৌঁছে দেন। জীব জ্ঞানলাভ করে বুঝতে পারে, সে আদতে শিব। জীবের অবিদ্যার অহং বা 'কাঁচা আমি' তাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। জীবকে সেবারূপ মাতৃস্নেহ স্পর্শ করে সেই ভ্রান্তির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে তাকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। জীব আর তখন জীব থাকে না—আরও সজীব হয়ে শিবত্বে উত্তীর্ণ হয়।

শুষ্ক জীবনের কাঠিন্যে বিপর্যস্ত ও আশঙ্কা-জর্জরিত শরণাগত এক স্বাধীনতা সংগ্রামী, পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে চরমতম আশ্বাস দিয়ে শ্রীমা বলেছিলেন, ''যখন দুঃখ পাবে, আঘাত পাবে, বিফলতা আসবে, তখন নিশ্চিত জেনো আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি।'' আমাদের জীবন দুঃখের আগুনে পুড়ে ছারখার হচ্ছে, আঘাতের যন্ত্রণায় আমরা কাতর। আর বিহ্বলতার অন্ধকারে বিহ্বল আমরা যে-অনির্বাণ ঊর্ধ্বমুখী দীপশিখাকে দেখতে পাই, সেই দীপশিখা আমাদের প্রাণের স্পন্দনের সঙ্গে তিরতির করে কাঁপছে; আর ক্রমাগত বলে চলেছে, ''কেউ না থাক, জানবে তোমার একজন মা আছেন।''

আজকাল শিক্ষাকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। শিক্ষার সুবিধা যাঁরা লাভ করেন তাঁরা অনেকেই ভোগবিলাসের স্রোতে ভেসে যান। ফলে শিক্ষার সংযমের দিক অথবা সংযমের শিক্ষার দিক আজ অপসৃতপ্রায়। তবু আমাদের বিশ্বাস, অবিদ্যাশক্তিকে অতিক্রম করে একদিন বিদ্যাশক্তি উন্মোচিত হবে, যার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকবেন শ্রীশ্রীমা সারদা। আদ্যাশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে ভারতবর্ষ আগামী পৃথিবীকে সাম্য, প্রীতি ও মৈত্রীর পথে পরিচালিত করবে। আমরা স্মরণ করি স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে সেই অমোঘ আহ্বান : ''আর এক বার সেই দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এসো, তোমরা সকলে সেই আলোর রাজ্যে প্রবেশ করো।''